এলিয়ট -এর উত্তরাধিকার এবং বিষ্ণু দে

জীবেন্দু রায়

এলিয়টের The Waste Land কাব্য প্রকাশিত হবার সময় কবি বিষ্ণু দে-র বয়স ছিল কমবেশি তেরো। প্রথম যুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লব দু-ই তখন সবে ঘটে যাওয়া ইতিহাস। অসহযোগ আন্দোলন এ-কাব্য প্রকাশের মাত্র এক বছর আগেকার ঘটনা। দেখবার যে এই একই বছরে বেরিয়েছিল তেইশ বছরের তরুণ কবি নজরুল-এর অগ্নিবীণা। কল্লোল-কালিকলম পত্রিকার যুদ্ধ ঘোষণা আরো কিছুটা পরের ব্যাপার। কিন্তু সে ব্যবধান সামান্য সময়েরই। কিন্তু সে ব্যবধান সামান্য সময়েরই। কল্লোল-এর কালের কবিরা সময়ের ভাষা খুঁজতে এবং সময়কে ভাষা দিতে, রবীন্দ্রনাথের জগৎ থেকে বার হয়ে কিছু করার বাসনা নিয়ে ইয়োরাপের কবিদের কাছে নিজেদের মতো করে হাত পাতলেন। সুধীন্দ্রনাথ নির্বাচন করলেন লরেন্স, ভালেরি বা মালার্মের মতো কবিদের, বুদ্ধদেবের পছন্দ হল বদ্‌লেয়রকে, বিষ্ণু দে গ্রহণ করলেন এলিয়টকে। এই এলিয়ট আরো অনেকের মতো আমাদের সেদিনকার কবিদের দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে ছিলেন, উপলব্ধিকে করেছিলেন গভীরতর। পরাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক, শিক্ষিত বাঙালি তার নাগরিক বিবর্ণতার তুলনা অনেকটা খুঁজে পেয়েছিল এলিয়ট -এর কাব্য - কবিতাতে। ইংরেজি থেকে তুলে এনে তাকে বাংলার মাটিতে রোপণের চেষ্টাও ছিল আন্তরিক। মরুমাটি-তো শুধু এলিয়ট-এর কাছে সত্যি ছিল না, রুশবিপ্লব পরবর্তী সময়ে যাঁরা বেড়ে উঠেছিলেন তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন, রূপকথার রাজপুত্রের মতো এক কল্পতরুপ্রায় সামাজিক দর্শন এই মরুভূমিকেই শস্যময়ী করে তুলবে। বিষ্ণু দে এই বিশ্বাসীদেরই একজন।

শুধু বিশ্বাস নয়, কবিতাকে তার আঙ্গিক বা কাব্যশরীর - এর উপস্থাপনাতেও রোমান্টিসিজম্ - এর আবেষ্টনী থেকে বার করে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন এই কবিরা। বিষ্ণু দে নিজে একটি ইংরেজি রচনায় যে কথা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হল যে এলিয়ট আমাদের আত্মসচেতনতা তীক্ষ্ণতর করেছেন। সেই আত্মসচেতনতা এসেছে বাস্তবেরই একটা রূপ হিসেবে। তাঁর আদর্শে, কবিতাকে কবিতা হিসেবে ভাল হতে হবে, শিল্পিত হতে হবে। ইতিহাস এবং সাহিত্যের ইতিহাস হবে জীবন্ত উৎসের মতো। এই ইতিহাস একটা প্রবাহ-পরম্পরার অনুসরণেই অতীত এবং বর্তমানের অব্যাহত যোগ বজায় রেখে চলে।

একটি কথা অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। এলিয়ট -এর এই কাব্য (The waste Land) পশ্চিমী এবং বাঙালি পাঠক— দুই শ্রেণীর কাছে আলাদা আবেদন নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল। উপনিবেশের বাঙালি তখন সব অর্থেই ঘরে বাইরে হতাশ এবং নিঃস্ব। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার কাছ থেকেও তার তেমন কিছু আর পাওয়ার ছিল না। ১৯৪১ -এ সভ্যতার সংকট লেখবার অনেক আগেই কালান্তর রচনায় সেই মানসিক নিঃস্বতা তথা দৈন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপ তথা প্রতীচীর ধ্বংসাত্মক রূপের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন, বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এই পরিপ্রেক্ষিতে এলিয়ট-এর মধ্যে তাঁদের ভাবনা, বিশ্বাস এবং দীর্ঘশ্বাস খুঁজে পেলেন। বিষ্ণু দে-র কবিতা তার সবচেয়ে বড় উপস্থাপনা।

উর্বশী ও আর্টেমিস বিষ্ণু দে-র প্রথম কবিতার বই। শুধু এলিয়ট নয়, কবি, রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড কীর্তি ও প্রভাব' -কে পার হতে চাইছেন। যদিও সেই পার হবার ব্যাপারে প্রেরণা কিন্তু এলিয়ট-ই। রবীন্দ্র - বিরোধিতায় কবির গলা এখানে খুবই উঁচু। কেননা পশ্চিমের এই কবিকে মার্কসের সঙ্গে বরণ করেছেন তিনি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে প্রত্যয়ের পরিবর্তনই তাঁর ঘটুক না কেন, এই পর্বে কবিগুরুর তাঁর মানসিক অস্থিরতার আশ্রয় ছিলেন না।

মরুমাটি -র ছবিই এলিয়ট এর একমাত্র অন্বিষ্ট ছিল না। হার্ডি যেমন In time of breaking of the nations কবিতায় প্রথম যুদ্ধের পরবর্তী ধ্বস্ত মৃতপ্রায় - জীবনের মধ্যে থেকেই আবার ভালোবাসা এবং নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, এলিয়ট -ও স্বপ্ন দেখেন এক নতুন উর্বর সভ্যতার। মনে রাখতে হবে, কবি বিষ্ণু দে-ও কিন্তু কবিতায় ঐতিহ্যের বন্ধ্যাত্ব দূর করতেই সুন্দরের দেবি আর্টেমিসের উপাসনা করেছেন। এ আর্টেমিস শুধু উর্বরতার প্রতীক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেন না, তিনি তারুণ্য এবং উর্বরতার পালয়িত্রী এবং রক্ষাকর্ত্রীও বটে। এই উর্বরতার ভাবচিত্র আমরা পেয়েছি চোরাবালি বা অন্বিষ্ট এর মতো কালপর্বেও। বিশেষ করে ঘোড়সওয়ার কবিতার কথা তো সকলেরই মনে থাকার কথা। কিন্তু দেখবার যে বিবর্ণতাকে বাদ দিয়ে কবি স্বপ্নের জাল বোনেন না। শুধুই স্বপ্ন, শুধুই ভবিষ্যতের আশাচিত্র তাঁর মন এবং কালের পক্ষে সত্যিই হবে কীভাবে!

কিছু টুক্‌রো টুক্‌রো কবিতায় এই দুই কবিকে ধরবার চেষ্টা করতে পারি। যেমন নতুন কাল এবং উর্বর জীবন ও সমাজের ছবি। ভাবা যায় চোরাবালি কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা ঘোড়সাওয়াব -এর কথা। এলিয়ট - এর—

Here is no water but only rock
Rock and no water and the road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water...

এই চিত্রকল্প কবি বিষ্ণু দে-তে এই মর্মে সংহত হয় :

চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া
এখানে কখনও বাসর হয়নি গড়া?
মৃগতৃষ্ণিকা দূর দিগন্তে ডাকি...

দেখবার যে এই কাব্যের গার্হস্থ্যাশ্রম, মন দেওয়া নেওয়া বা শিখণ্ডীর গান - এর মতো কবিতায় নারী - পুরুষের প্রেম ও যৌনতাকে দেখানো হয়েছে নিরর্থক বন্ধ্যাত্বর পরিপ্রেক্ষিতে। পটভূমি অবশ্যই বিংশ শতাব্দীর বিশেষ করে প্রথম যুদ্ধ পরবর্তী এবং মন্দা - সমসাময়িক কালের এলিট মানুষ ও মন। লিলি, ডুলু, সুরেশ, অমল বা মোহিত- এর মতো চরিত্রগুলির কথা নিশ্চয়ই আমাদের মনে পড়বে। এসব লিখে, জেনে অথবা ভেবেও কিন্তু উজ্জ্বল দিন অথবা উর্বরা ভবিষ্যতের ভাবকল্প তিনি কখনই সরিয়ে ফেলেন না।

কিন্তু প্রেমের যান্ত্রিকতা বা অভ্যাসের দাসত্ব নিয়ে এলিয়ট -এর মতো আমাদের কবিও বিদ্রূপ করেন— বোধহয় রবীন্দ্রের রামধনুকে মিথ্যে বলে দেখানোর জন্যই। প্রেমের অবলম্বন যে আবিষ্ট যৌনতা— এ আবিষ্কার নতুন কোনো কিছু পাওয়া নয়। বৈষ্ণব - সাহিত্যে গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাসের মতো মহাজন - পদকারেরাও শরীরের আশ্লেষ - আকর্ষণকে পদের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শরীর আবেগ কবিতায় কী মাত্রা আনত বলা শক্ত, কিন্তু ''অভ্যাস শুধু অভ্যাস...ভালো তাই তো বাসি'' অথবা—

সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মিলি?
আমাদের ভালোবাসা প্রাকৃতিক, লিলি...

এলিয়ট - এর কবিতায় ছিল সেই কেরানী ছেলেটির কথা, যে টাইপিস্ট মেয়েটির কাছে তার শরীরের স্বাদ মাত্র নিতে আসে এবং তা হয়ে গেলে আর কোনো অস্তস্তি, অস্থিরতা বা দায়িত্ব কিছুই থাকে না। তাঁর নায়িকা গর্ভপাতেও সঙ্কোচ বা বিমর্ষ বোধ করে না। যে সমাজে আমরা রয়েছি তাতে 'একনিষ্ঠ' বা 'একনির্ষ্ঠা কথাটাই একটা অত্যাচার, উপদ্রব অথবা অপ্রাকৃতিক উপসর্গের মতো। 'প্রেম' - কে বিষ্ণু দে ব্যঙ্গ করেন, কিন্তু এ স্বপ্নও আবার একই সঙ্গে দেখেন'

কোন্ ক্ষণে
মননের সমুদ্র মন্থনে—
রূপ নেবে এক নারী—
মনোময় প্রাণপদ্মে সংসারের কারা আর তপ্ত শয্যা ছাড়ি?

এলিয়ট - এর কবিতায় ছিল শীতের সকালের বাদামি কুয়াশার অবাস্তব লন্ডন্। আমাদের কবি সেই মডেল সামনে রেখেই যেন ভারতে চেষ্টা করেন :

জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপন সঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে
পিঁপড়ের সারি
গৌড়জনে ভিড়াক্রান্ত মধুচন্দ্র হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর!
(টপ্পা-ঠুংরি, চোরাবালি)

'জানিনি আগে' তো এলিয়ট -এরও কথা। ১৯৩৬ -এর জন্মাষ্টমী-তেও পেয়েছি:

তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজই বলো, না হয় ফ্লাশ্।
ঘোরতর উত্তেজনা, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাস্য।
তারপরে বাড়ি
অম্লশূল আর সর্দিকাশি
এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেঁসি, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল।

এলিয়ট-এর প্রকরণ এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'হিরন্ময় ঢাকা' 'পুষণ' 'নাচিকেত মেঘ' সাবিত্রীর 'সম্পূরণ' এবং 'উদ্গতির হিরন্ময় জাল' - এর চিত্রকল্প তাঁর কবিতাতেও এসেছে, কিন্তু শেষ বিশ্বাসটুকুতে ভগবানের কথা নেই। বরং নাগরিক মলিনতা এবং শূন্যগর্ভ জীবনকথাই যেন বারবার ঘুরে আসতে চায়। পূর্বলেখ-এর পরে যে সমস্ত কবিতার বই তিনি লিখেছেন সেখানে চার আর পাঁচের দশক তাদের দৈন্যের কিছু বাকি আর রাখেনি। কিন্তু পুনরাবৃত্তি করেই বলবার যে, এসবের মধ্যে থেকেই বা এই দৈন্যের মধ্যে থেকে নতুন কালের প্রত্যয় ধ্বনিত হয়ে ওঠে এই মর্মে:

আমাদের ক্ষীণ হাতে বলবান নাড়াবে কালের চাকা
অমৃতের ঢাকা খুলবে মুক্ত হিরন্ময় স্বদেশ। (চতুর্দশপদী)

অম্বিষ্ট - এ কবি বলে ওঠেন :

অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সসম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।

মার্কসীয় বিশ্বাসের পথ ধরেই আনন্দে পৌঁছতে চেয়েছেন আমাদের কবি। এলিয়ট - এর হাঁটা পথ ধরে তত্ত্ব এবং দার্শনিক নয়। অক্ষমতায় কখনও ভীষ্ম, কখনও বা বৃহন্নলার মতো আর্তনাদ করেন তিনি। অবশ্য আর্তনাদেই থামেন না। তারপরে দেখি তাঁর প্রত্যয়ী মুখের ছবিও। বিবর্ণ জীবনের পাশে সে অবশ্যই এক অন্য মাত্রা। সেদিনের 'সোভিয়েত' সমাজের ছবি আমাদের কাছে যে ভাবে স্বপ্ন -মাখানো রঙে এসে পৌঁছেছিল, তার সঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, শ্বাসরুদ্ধ করা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ সবেরই যেন প্রতিবিধান - সমাধান কবি খুঁজে পান— মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টি আর কর্মসূচির মধ্যে। সাত ভাই চম্পা - তে আছে :

আবিশ্ব সমরে
অসহায় কলকাতার মধ্যবিত্ত
কুরক্ষেত্রে করুণা কুড়ায়।...
...তবু, চীন, রুশ্—
দেশে দেশে কৃষাণ মজুর যত ঢেলে দেয় তাদের পৌরুষ
স্বার্থের বর্ধিষ্ণু ছিদ্রে, বনেদীর বনিয়াদে, মুমূর্ষু অস্থির
দলে দলে যুদ্ধ চলে, ভারতেরও ভিৎ টলে...

চতুর্দশপদী-র পাঠ:

দুর্ভিক্ষের বঞ্চিত হাতে বানাব বিজয়ী দেশ
লক্ষ দুঃস্থ মুমূর্ষুর হাতে নরকের ভিড় ভেঙে
আমাদেরই ক্ষীণ হাতে বলবান নাড়াব কালের চাকা
অমৃতের চাকা খুলতে হিরন্ময় স্বদেশ

অথবা:

...ভেদহীন
সমাজের বিশ্বব্যাপী ভূমিকায়। শ্রমিকজনের
সাগর সঙ্গমে আজ উৎসৃজিত রুশ জনগণ!
তোমাদের ভগীরথ— বিশ্বব্যাপী সবারই লেনিন। (৭ই নভেম্বর)

একই সঙ্গে যেখানেই অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতি এলিয়ট-এর। The Waste Land যেন সরাসরি এসে গেছে অম্বিষ্ট -এর শুশুনিযা-য়; এল্‌সিনোরে বা জল দাও -এর মতো কবিতায় রয়েছে Burnt Norton -এর দূর সাদৃশ্য।

অথচ দেখবার যে এই ওয়েস্টল্যণ্ডীয় ভাবকল্পের দ্যোতনা নিজের বিশ্বাস এবং লক্ষ্যেই অনায়াসে উপেক্ষা করে কবি এগিয়ে গেছেন। এ হল 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' পর্বের অর্জন :

পোড়ো জমি চ'ষে শেষে স্বত্ব জমে লাট— কি বেলাট,
সে সন্ন্যাস কবে ছদ্মবেশ?
পৃথিবীর বৃহত্তর সাম্রাজ্যের অন্তিমে লর্ড এলিয়ট
ওএস্টল্যাণ্ডে চ'ষে নেন আপন স্বদেশ?
তাইতো বলেছে শাস্ত্রের সদা আছে ভয়
বিড়াল তপস্বী হোক না মহাশয়!...

এলিয়ট -এর সঞ্জীবনী ভূমিকা অথবা স্বাদ কিন্তু থেকেই যায়। পথ এবং তার অনুষঙ্গ (association) অবশ্য পৃথক। শান্তির বাণী প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে প্রতীচীর এই কবি খুব স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারণ করেছিলেন। সে শান্তি আমাদের কবিও খুঁজেছেন, কিন্তু মার্কসীয় ধনবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞায়। এ বেদনাও তীব্রভাবে উচ্চারিত থাকে যে এই ওয়েস্টল্যাণ্ড বা মরুমাটির ধূসর উর্বর সময়ে রবীন্দ্রনাথের কি আর কোন প্রাসঙ্গিকতা বা প্রকৃত অর্থবহতা আছে? তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ কবিতায় পাচ্ছি:

অপঠিত, নির্মনন, নেই আর কোনোও আবেদন?
সাবিত্রীর ক্ষিপ্রকর বিভা
আমদের দুস্থ চিরগোধূলিতে ম্রিয়মান?
আলোহীন অন্ধকারহীন আপন সত্তার থেকে পলাতক
নিস্তব্ধ থাকার ভয়ে একার সংশয়ে জনতার অপমানে
নিত্য রুচি— ক্ষয়ে ক্ষয়ে অসুন্দর?

এই ক্ষয় - রোগগ্রস্ত পঙ্গু গতিহীন স্বদেশ যা মরুমাটিরই প্রতিতুলনা, সেখানে 'ছোট্টমেয়ে রানী'র মতো কেউ কী করে যে ঠিক বড়ো হয়ে উঠবে, অর্জন করবে কিশোর যৌবন পার হয়ে প্রৌঢ়ের প্রশান্তি, কীভাবেই বা সে আলোয় ভরে দেবে অন্ধকার— এ চিন্তাও কবি ভেতর থেকে উঠে এসেছে। সে চিন্তা মানুষমাত্রের অস্তিত্বের স্থিতি এবং চেতনার বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে; নতুন বাসযোগ্য পৃথিবীর স্বপ্নে এই অন্নময়সত্তা এবং সমৃদ্ধ বিবেকী ব্যক্তিচেতনার যুগলবন্দী। বিষ্ণু দে-র কবিতায় ক্ষয় আর রুক্ষতার চিত্রকল্পে এই আধুনিক সচেতন বস্তুনিষ্ঠ বোধই অন্তর্লীন থাকে নিশ্চিত নেপথ্য ভূমিকার মতো। তাতে মাত্রা যোগ করে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় তাঁর নিবিড় বিশ্বাস বা আস্থা। এলিয়ট -এর ক্ষেত্রে এ আশ্রয় ছিল এক ঈশ্বর - অন্ত প্রাণ মানসিকতায়। সেই জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত চেতনাই আমাদের ত্রাণ করবেন। আমাদের বলতে বিপন্ন, বিপথগামী, পঙ্গু, বঞ্চিত মানুষ এবং সমাজ। আর তাই ঐ দৃশ্যই তাঁর কবিতার শেষে খুব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যেখানে মানুষ মন্দিরে গিয়ে তার প্রাণের সেই দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে:

Now they go up to the temple. Then the sacrifice
Now come the virgins bearing urns
আলো পিপাসা এই সংলগ্ন আইডিয়া এবং আবেগ :
Please, will you
Give us light?
Light
Light...

জন্মাষ্টমী-তে এরকম একটা মুহূর্ত সত্যি হতে চাইছিল যেখানে রয়েছে :

ক্ষান্তকরো, ক্ষান্ত করো এই অন্ধ দুষ্ট বিদূষণ
তুলে দাও হিরন্ময় ঢাকা
যে যম, হে সূর্য, হে পূষণ!

অথবা

হে বন্ধু, এ নাচিকেত মেঘ
আসন্ন মুমূর্ষা ক্ষুব্ধ অমার পাতাল
ধুয়ে দিক, বজ্রযোগে বিদ্যুৎ অঙ্গারে
উড়ায়ে পুড়ায়ে দিক, বিষঙ্গের উজ্জীবনে
সঞ্জীবনী প্রতিষেধে, সাবিত্রীকে সম্পূরণে
বেঁধে দিক হে সুশ্রুত, উদ্‌গতির হিরন্ময় জালে।

এমনই একধরনের আস্তিক্যবাদী উচ্চারণ। কিন্তু এ বোধে কবি শেষ পর্যন্ত একেবারেই স্থির থাকেননি। পূর্বলেখ বা নাম রেখেছি কোমল গান্ধার - এর পরে এলিয়ট -এর মানস - প্রকৃতির সংলগ্নতা থেকে আমাদের কবি নিজেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। আলেখ্য কাব্যে একটি মাত্র কবিতাতেই এই ছুঁয়ে যাওয়া ব্যাপারটি আছে। মহাত্মাজির ভাবকল্প ভাষা পেতে চেয়েছে 'জন্মাষ্টমী ১৩৫৪' কবিতায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন নোয়াখালি-র মতো একটি অসামান্য প্রবন্ধ যার কেন্দ্রে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। বিষ্ণু দে এই কবিতায় তাঁর নাম উল্লেখ না করেই আনলেন, সেই ব্যক্তিমহিমারই ভাবপ্রতিমা, যেখানে ছিল:

'শান্তি চাই, (মোটামুটি) শহর গ্রামের'
চেয়েছি শৃঙ্খলা,
দেখেছি তো ভোটাভুটি, বিদেশী স্বদেশী হরেক শৃঙ্খলা।
আমার রামের
রাজত্বের রামই নেই...
খেলছে আমার এই স্থাবর স্বপ্নের রামরাজত্বই।
'আমার দধীচি দেহে যতদিন প্রাণ আছে—
অনুচ্চাকৃত তবু অবগুণ্ঠিত সত্যেরই নিষ্ঠায়—
চলো সবে শান্তি সেনানী'...
'নিঃসঙ্গ অশীতি
আমার বিজয়বার্তা তাই আজ গোত্রহীন সত্যকাম মহাজনতায়
খুঁজে ফেরে দীর্ঘজীবনের অর্ঘ্যে দুর্বিষহ স্মৃতি!'
রবীন্দ্রনাথের থেকেও এর প্রেরণা তিনি পেয়ে থাকবেন।

তবে এ এলিয়ট নানাভাবেই ছায়া ফেলে চলেন বিষ্ণু দে-র কাব্যবলয়ে। সে ছায়া শুধু প্রথম দিকের কবিতায় নয়, পরেও, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' -এর মতো কাব্য লেখেন, সেখানেও Burnt Norton এর 'Time present and time past' যে ভবিষ্যত' এর মধ্যেও বর্তমান থাকতে পারে (Are time perhaps present in time Future) এবং সেই সঙ্গে 'All time future contained in time past./if all time is eternally present./ all time is unreedmable'-র অনুবর্তনে আমাদের কবির কলমেও শিশুদের মেলা দেখার সূত্রে একই কালচেতনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে:

এরাই একাল থেকে সেকালের মোগল পাঠান মৌর্য বা কুশান
বহু মৃত্যু দেখে চলে যায় অনাহত খেলার প্রত্যয়ে
ভবিষ্যতে, যা এদের বর্তমান, এরা যার পুষ্টি ও পুষণ।

ষাটের দশকে কবির ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে কবিতার বইয়েও এলিয়ট নানান বাকপ্রতিমার মধ্যে (যেমন ফাঁপা মানুষ পোড়ো জমি, ফণিমনসা ইত্যাদি) অবারিত হয়ে ওঠেন। শুধু বাইরের দিক থেকে নয়, বিষ্ণু দে-র কবিতার প্রকৃতির পক্ষেও তা অবিচ্ছেদ্যভাবে সত্য এবং আনন্দসস্মিত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়। কবির আপ্রাণ যত্ন ছিল, বাংলা কবিতার মূল প্রবাহের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দেওয়াতেই। নতুন জগৎ, নতুন দিগ্‌বলয়— এখানকার জল, মাটি, হাওয়া, সংস্কার আর ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রেখে। আধুনিক জীবন বা সভ্যতা একমুখী আদর্শের দিকে স্থির নিবদ্ধ কোনো আদর্শ, দায়বদ্ধতা বা বাতাবরণ নয়— তার বৈচিত্র্য, জটিলতা বহুমুখী, বহুস্তরী— একই সঙ্গে তা সংবেদনশীল, রীতিমতো ইন্দ্রিয়বেদ্য, স্পর্শকাতর কখনও কখনও। আজকের যিনি কবি, এই বিচিত্র জটিলতাকে সত্য জেনে, স্বীকার ও আত্মস্থ করেই অগ্রসর হবেন। কালের ধর্ম ও দাবি তাই। একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে ইচ্ছে যায়: প্রেমের ব্যাপারে নায়িকার শরীর বিভঙ্গের দ্যোতনায় বিষ্ণু দে আপ্লুত হতে পারেননি। তাঁর নাগরিক শিক্ষিত মন বলে উঠেছে যে একটি পুরুষের কাছে একটি নারী শুধুমাত্র প্রেমের স্বার্থে ও শর্তে কোনো আত্মনিবেদন করছে না। তার অনুচ্চারিত শর্ত হল আভিজাত্য — যার সূত্র বা উৎস হল— মেধা (বিদেশী বিদ্যা) এবং বৈভবের ভার ও দীপ্তি। ছলা - কলা বা চতুরালিতে প্রেমের অভ্যস্ত মুদ্রা প্রকাশ পায়— আকুলতা, অতৃপ্তি বা অন্তরঙ্গ কোনো অদম্য আকাঙ্ক্ষা নয়। এলিয়ট -এর মেধা ও আভিজাত্যদর্পী তথাকথিত অন্তঃসারশূন্য কিন্তু বাইরের দিক দিয়ে পরিশীলিত নারীপুরুষ যেভাবে মাইকেল এঞ্জেলোর কথা বলতে বলতে চলা ফেরা করে, প্রমাণ দিতে চায় তারা কত বড় 'মহাশয় বোদ্ধা' এবং আলোচনার স্তর বা মাত্রায় কতদূর যেতে পারে, বিষ্ণু দে-র নায়ক - নায়িকারও তেমনই সেই প্রদর্শনবাদী (exhibitionist) মানসিকতাতেই কলকাতা শহরের 'ফাঁপা' নাগরিক জীবনকে একই মাত্রায় ভাষা দেয়।

অনেক কথা, ভাব; অনেক প্রসঙ্গ। একই কথা আবার বলতে হয়: যে জীবন ও সভ্যতার মধ্যে আমাদের দিনযাপন, তার না-বাচক রন্ধ্রগুলো প্রাচী ও প্রতীচীর এই দুই কবিপুরুষ একই রকম অভিনিবেশে চিহ্নিত করেন। বেরোনোর পথ, এককথায়, দুজনের ক্ষেত্রেই সহজিয়া। এলিয়ট খ্রীষ্টিয় মাপ ও ধাঁচে শুদ্ধিকরণের পথকে পরিত্রাণের পথ বলে মনে করেন। এই শুদ্ধিকরণ গ্লানিমোচনের পথ। অতি সংক্ষিত পারিভাষিক-পরিচিতিতে যা হল আধ্যাত্মিকতার পথ— করুণাময় ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনের পথ। এই কবি যখন আগুনের কথা অনেক, তখন তা স্পষ্টতই সেই কল্পিত শুদ্ধির রূপক— প্রতীকই হয়ে যায়।

প্রচলিত অর্থ-তাৎপর্যে বেদ - পুরাণ-উপনিষদ, সূর্যবন্দনা, গায়ত্রী মন্ত্রের বহুপ্রচল অনুষঙ্গ, অন্ধকারের দরজা খুলে ফেলার ভাবকল্প বিষ্ণু দে-র কবিতাতেও আছে। কিন্তু তার নির্যাস বা শেষ কথাটুকু আধ্যাত্মিকতার পথে নয়। 'সবিতুর্বরেণ্যম্ ধীমহি প্রচোদয়াৎ' বললেও আরো কথা আছে। যেমন ফ্রয়েডে আস্থা রয়েছে বিষ্ণু দে-র রীতিমতো। মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টি সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। স্বভাবিক যে রাষ্ট্রতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর কোনো অনুরাগ - আসক্তি এই সূত্রে একেবারেই নেই। নাট্যকার এলিয়ট সম্পর্কেও আমাদের কবি খুব অনুরক্ত ছিলেন এমন সাক্ষ্যপ্রমাণও নেই। মার্কসীয় বিশ্বদৃষ্টিই তাঁর পক্ষপাতের গণনকে চিহ্নিত করে। যদিও মহাত্মাজি-র আত্মপ্রত্যয়ীরূপও তাঁর শ্রদ্ধার কারণ। সুভাষ বা সুকান্তের মতো উচ্চকিত সরল বিশ্বাসে বিপ্লবকে দেগে না বসিয়ে তাতে এনেছেন পরিশীলিত প্রকরণ— কাব্য কৌশলের প্রসাধিত রূপের মধ্যেই। কবি চান বা না-চান তাও এক এলিটিস্ট রূপায়ণ। বিপ্লব বা সমাজবদলের আকাঙ্ক্ষা যত সত্যি ততটাই সত্যি সেই আকাঙ্ক্ষার বাণীবিন্যাসকে কবিতা হিসেবে যথার্থ করে তোলা। জীবনচর্যা বা হৃদয়ানুভবে ততটা একেবারেই নয়, পীড়িত বা শোষিত মানুষকে তিনি যতটা মনন বা মেধায় সত্যি করে পান অথবা সত্যি করে তোলেন। এ ক্ষেত্রে নজরুল বা সুকান্তের তুলনা তাঁর মধ্যে খুঁজলে অন্যায় হবে। বিদ্যার দীপ্তি, পরিচ্ছন্ন নাগরিক - জীবন, পরিশীলিত কাব্যস্বভাব বুদ্ধিজীবী কবি হিসাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে।

চিন্তাগত স্তরে এইরকম সর্বাবয়ব মার্কসীয় বিশ্বাসের বুনন তাঁর সমকালীন কবিদের ক্ষেত্রে এই মান্যতা পায় নি। সুভাষ, সুকান্তের কথা আগেই বলেছি (দিনেশ দাসের নামও করতে পারি), চিন্তার থেকে স্বপ্নের ফ্রেমই সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে। যে জন্য আত্মসমালোচনা, জীবনের জটিলতা বা তার ভেতরের নঞর্থকতা বা মানুষের স্বভাবগত আত্মদ্বিখণ্ডনকে তাঁরা দৃশ্যপটে সেভাবে আনেননি। সুকান্তের সময় হয়ে ওঠেনি, সুভাষের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। বিষ্ণু দে-র স্বতন্ত্রতা সেক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত। যদিও সেই পুনরাবৃত্তি অনিবার্য — এই স্বাতন্ত্র্য হৃদয়দর্মের সহজ পথে নয়, চিন্তার বিন্যাসে।